ইতিহাসে হাতেখড়ি

দেশের মানুষ

তিস্তা দাস

ছবি

রঞ্জিত চিত্রকর

সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর

IDSK

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

ইতিহাসে হাতেখড়ি: দেশের মানুষ

লেখা - তিস্তা দাস

কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২২

ইতিহাসে হাতেখড়ি: দেশের মানুষ
কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২২

লেখা – তিস্তা দাস
সম্পাদনা – অন্বেষা সেনগুপ্ত, দেবারতি বাগচী
ছবি– রঞ্জিত চিত্রকর, সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর
প্রচ্ছদ, মানচিত্র ও পরিকল্পনা – ওয়াসিম হেলাল
মুদ্রণ – এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
প্রকাশক - ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা
ডিডি ২৭/ডি, সেক্টর ১, কলকাতা - ৭০০০৬৪
ওয়েবসাইট - www.idsk.in
ইমেইল - idsk@idskmail.com / office@idsk.edu.in

আর্থিক সহায়তা – রোসা লুক্সেমবুর্গ স্টিফটুং, লিয়াসঁ অফিস, নয়া দিল্লী
সি -১৫, এস ডি এ মার্কেট, নয়া দিল্লী - ১১০০১৬
ওয়েবসাইট – https://www.rosalux.in
ইমেইল - south-asia@rosalux.org
এই বইটি শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি/অসরকারি প্রতিষ্ঠান, নীতি নির্ধারক সংস্থা, সংবাদ মাধ্যম, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

This publication is sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with grants from the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. This publication or parts of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication.
The content of the publication is the sole responsibility of the partner and does not necessarily reflect a position of RLS.

সূচিপত্র

গোড়ার কথা	৭
দেশভাগ	১৩
আইন-কানুন	১৯
অনুপ্রবেশকারী	২১
নাগরিক আইন ২০১৯ বা CAA	২৫
জাতীয় নাগরিক পঞ্জী বা NRC	৩০
অসম	৩৩
গঙ্গাধরের কথা	৩৯
হাসিনা ভানু	৪১
বর্ডার	৪৫
শেষের কথা	৫০
লেখক ও শিল্পী পরিচয়	৫৩

ইতিহাসে হাতেখড়ি : দেশের মানুষ

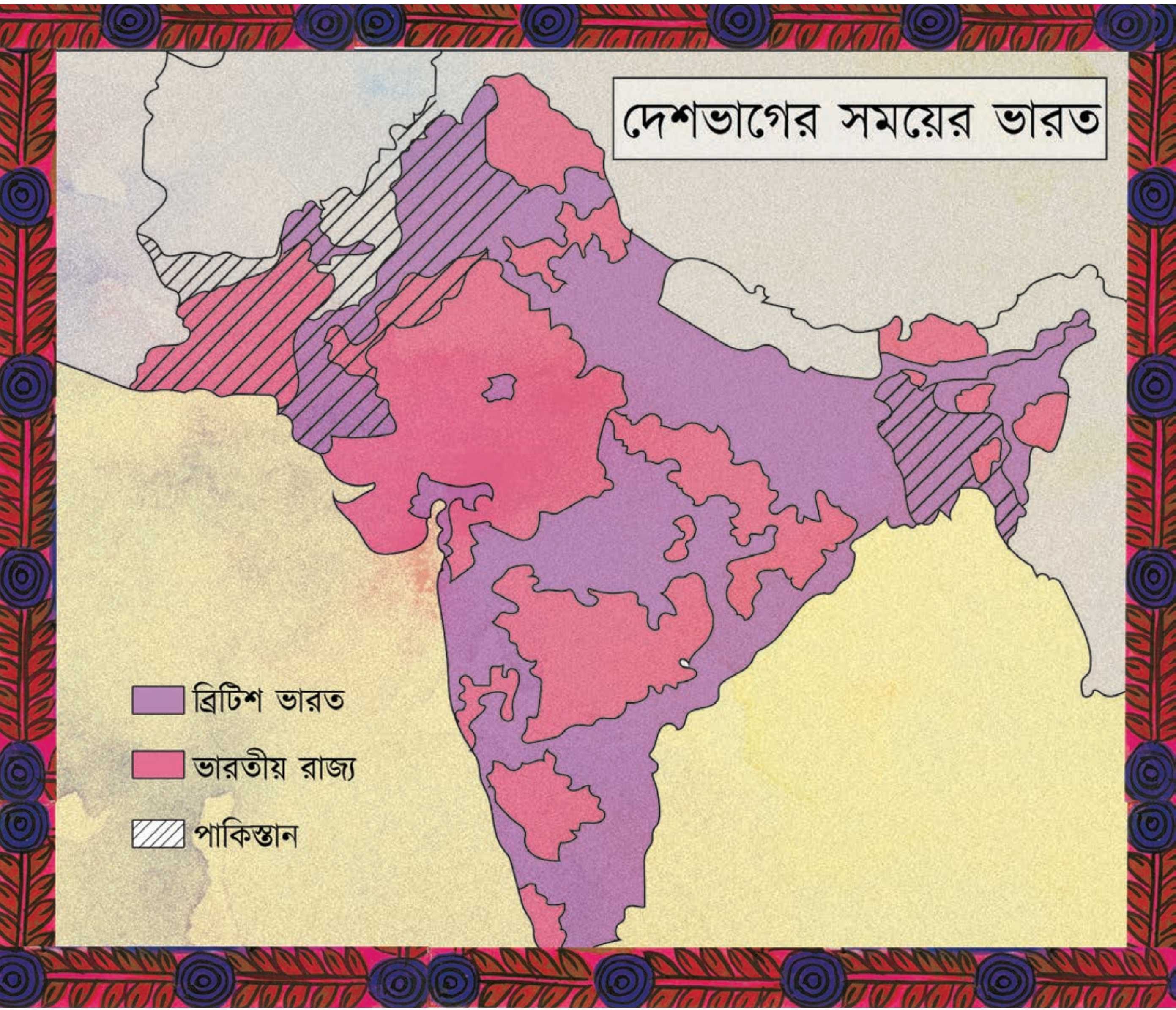
দেশভাগের সময়ের ভারত
ব্রিটিশ ভারত
ভারতীয় রাজ্য
পাকিস্তান

গোড়ার কথা

সেই ১৯৪৭ সালে দেশ যখন ভাগ হয়েছিল, একটা সাপের মতো আঁকা বাঁকা সীমানা টানা হয়েছিল। নদী-নালা-পর্বত, সবকিছুর মধ্যে দিয়েই টানা হয়েছিল এই সীমানা। কিন্তু সব ভাগাভাগি করা সহজ কাজ নাকি! তাই হলও অদ্ভুত অবস্থা। যেমন ধরো, বনগাঁ-বেনাপোল সীমানা ঘেঁষে ছিল মালোপাড়া গ্রাম। দেশভাগের পর বনগাঁ পড়েছিল পশ্চিমবাংলায়, অর্থাৎ ভারতে, আর বেনাপোল পূর্ববাংলায়, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে। মালোপাড়া পড়ল ভারতের দিকে। গ্রামের একদিকে ছিল নদী, অন্যদিকে টানা হল আন্তর্জাতিক সীমানা। নদীর এপারের ভারতের গ্রামগুলোর চেয়ে সীমানার ওপারের পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলো ছিল মালোপাড়ার অনেক কাছে। গ্রামের লোকের নদী পেরিয়ে ভারতে আসার ঝামেলা ছিল অনেক। বিপদে আপদে তাই তারা ছুটত পূর্ব বাংলার মানুষগুলোর কাছে। দেশভাগের পরে মালোপাড়া ভারতের গ্রাম হল ঠিকই, কিন্তু সেখানকার মানুষের প্রাত্যহিক জীবন যেন ভারতের থেকে আলাদা হয়ে রইল।

আমাদের দেশে যে এক সময় ব্রিটিশ শাসন ছিল, সে কথা আমরা সকলেই জানি। ১৯৪৭-এ দেশভাগও যেমন হল, দেশ স্বাধীনও হল। তার আগে থেকেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে স্বাধীন ভারত একটা গণতান্ত্রিক দেশ হবে। মানে, এখানে ২১ বছর বা তার বেশি বয়সের সকলে

ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করবে। সেই সরকার দেশ চালাবে। দেশ চালানো সহজ কথা নয়। তার অনেক নিয়মনীতি, আইনকানুন থাকে। তাই বড় বড় নেতারা ভাবতে শুরু করলেন নির্দিষ্ট নিয়মকানুন কীরকম হবে, নতুন সরকার কীভাবে তৈরি হবে, এইসব নানা কথা। দেশ মানে কি কেবলই সরকার, নেতা-মন্ত্রী আর নিয়মকানুন? দেশ মানে তো দেশের সব সাধারণ মানুষ, বা নাগরিক। কিন্তু এই যে ধরো মালোপাড়ার মানুষ — তারা কাগজে কলমে ভারতের লোক কিন্তু যোগাযোগ তাদের পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বেশি। ভারতীয় হয়েও যেন তারা ঠিক ভারতীয় নয়; আবার তারা পাকিস্তানিও নয়। কে যে ভারতীয় আর কে নয় এই প্রশ্ন নিয়ে নানা আলাপ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক শুরু হল সেই সময় থেকেই। এই বইতে আমরা সেইসব আলোচনা আর নিয়ম-কানুনই বোঝার চেষ্টা করব।

স্বাধীন হওয়ার আগে অবধি কতরকম মানুষের আনাগোনা ছিল আমাদের দেশে! কিন্তু দেশ যখন স্বাধীন হল, তখন ব্রিটিশ ভারত ভেঙে হল দুটো দেশ — ভারত আর পাকিস্তান। যে জায়গাগুলো দেশভাগের পরে পাকিস্তানে পড়েছিল, সেখান থেকে সীমানা পেরিয়ে হিন্দু এবং শিখ উদ্বাস্তুরা ভারতে আসতে শুরু করেছিলেন। অন্যদিকে মুসলমানরা অনেকে সীমানা পেরিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ আবার ফিরেও এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এসে দেখলেন যে তাদের বাড়িতে অন্য লোকজন বসবাস করছেন।

ব্রিটিশ ভারতে অনেকগুলো দেশীয় রাজ্যও ছিল, অর্থাৎ যে সমস্ত রাজ্যে বিভিন্ন ভারতীয়

রাজা শাসন করতেন। এঁরা সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিলেন না। যেমন ধরো, হায়দ্রাবাদ বা কোচবিহার। এই রাজ্যগুলির নাগরিকদের কথাও মনে রাখতে হবে। তাঁরা এখন কার প্রজা, সেই নিয়ে শুরু হল ভাবনা। আবার আজকের ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে তখন ফরাসি আর পর্তুগিজদের শাসন কায়েম ছিল, যেমন ধরো পন্ডিচেরি বা গোয়া। সেখানকার লোকেরাও তো আছেন! আবার ব্রিটিশ শাসনের সময়ে কয়েক প্রজন্ম ধরে কত ইউরোপীয় মানুষ ভারতে বসবাস করেছেন, তাঁরাও রয়েছেন। ওদিকে আবার ব্রিটিশ শাসনের সময়ে ভারতবর্ষ থেকে অনেকেই বিভিন্ন কাজের সুত্রে কেউ বর্মা, কেউ শ্রীলঙ্কা কেউ মালয়, বা অন্যান্য দেশে গিয়েছেন, সেখানে বসবাস করেছেন অনেক বছর ধরে। এবার দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কীভাবে সেই প্রবাসী মানুষগুলো নতুন দেশের নাগরিক হবে, সেটাও ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল।

মোটকথা এই নানা রকম মানুষের মধ্যে ভারতীয় যে কে আর কে নয়, এই নিয়ে তখন নানা জটিলতা দেখা দিল। কিন্তু এই যে বললাম, ভারত একটা গণতান্ত্রিক দেশ, তার মানে এখানে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকার কথা। গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে ১৯৪৮-এর ১৫ই মার্চ সরকার বিভিন্ন রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছিল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচকদের তালিকা তৈরি করতে হবে যাতে পরের নির্বাচনে সবাই ভোট দেওয়ার অধিকার পায়। কিন্তু খাতায়-কলমে নাগরিকদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে মানেই যে সকলে সমান, তা কিন্তু হয় না। এই

কথাটাই একটু একটু করে এখানে বলব।

প্রথমেই আমরা একটু বুঝে নিই অধিকার শব্দের মানে। ভেবে দেখ, ক্লাসরুমে তুমি যা করতে পারো, অন্যরাও পারে। তার মানে ক্লাসে তোমার আর তোমার বন্ধুদের সমান অধিকার। তোমাদের যা মনে হয়, তোমরা বলতে পারো। তোমাদের সকলকে বইখাতা দেওয়া হয়। মিড-ডে মিল-এর জন্য সকলেরই নাম লেখা হয়। একজন কিছু পাবে, অন্যজন পাবে না, এমনটা তো আর হয় না! আবার ভেবে দেখ, তোমাদের সকলকেই শিক্ষকের কথা শুনে চলতে হয়, স্কুলের নিয়ম মেনে থাকতে হয়। একটা দেশে সকলের এভাবেই নিয়ম বা আইন মেনে চলার কথা, আর তাদের সমান অধিকার থাকার কথা।

কিন্তু এমনটা সব সময়ে হয় না মোটেই। দেশের নেতারা অনেক সময় এমন নিয়ম-নীতি তৈরি করেন, যাতে কারও বিশেষ সুবিধে হয়, আর কারও বিশেষ অসুবিধে। আবার ঠিক ঠিক নিয়ম তৈরি করাও মুশকিল হয়ে ওঠে কখনও সখনও। এক দল নাগরিক হয়তো নিজেদের সুবিধের জন্য আর এক দল নাগরিককে কিছুতেই মেনে নিতে চান না, সুযোগসুবিধে দিতে চান না। তাঁরা তখন নিয়ম পালটে ফেলার চেষ্টা করেন। কখনও আবার কেবলমাত্র নিয়মের দোহাই দিয়ে সরকার আর তাঁর পুলিশ ভারী হেনস্থা করে সাধারণ মানুষকে। তাই নাগরিকদের সমান অধিকার সবসময় বজায় থাকে না। এইরকম বেশ কিছু গল্প আমরা এই বইতে জানব।

কথা হল, এতসব নিয়ম ঠিক করল কারা? এই আইন তৈরি করা একটা কঠিন কাজ বটে। আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের মতোই কে নাগরিক আর কে নাগরিক নয় — এই নিয়ে হরেক নিয়মকানুন আছে। নানান সময়ে এইসব আইন তৈরি হয়েছে, পরে তার বদল হয়েছে। সে বিষয়ে একটু একটু করে বলি। শুরু থেকে শুরু করি। ফিরে যাই সেই দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ে, যখন দেশের মানুষ কে, তা নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়েছিল।

REGISTRATION

দেশভাগ

১৯৪৭এ দেশ স্বাধীন হলেও, সব আইনকানুন কিন্তু তখনই ঠিক হয়ে যায়নি। মানে সব লেখাপড়া করে তৈরি করতে তো সময় লাগে। এই যে লিখিত নিয়মকানুনের কথা বললাম, সেটাই হল একটা দেশের সংবিধান। এই সংবিধানই হল যাবতীয় বিধি-নিয়মের বই। সংবিধানেই লেখা থাকে দেশ কীভাবে চালানো হবে, নাগরিকের কী কী অধিকার।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের সংবিধান তৈরি হতে সময় লেগেছিল আরও বছর দুয়েক। সব কাজ শেষ হয়েছিল ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ সালে। আর তারও মাস দুই পরে, ২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০এ সংবিধান চালু করা হয়েছিল। ঘোষণা করা হয়েছিল ভারত প্রজাতন্ত্র, অর্থাৎ এমন একটা দেশ যেখানে প্রজারাই নেতাদের নির্বাচন করবে, যাঁরা দেশ শাসন করবে। এই প্রজারাই তো নাগরিক। একদিকে তো সংবিধান লেখা হল, ভোটের তোড়জোড় শুরু হল। অন্যদিকে তখনও দেশভাগের ধাক্কা সামলে ওঠেননি সাধারণ মানুষজন। দেশের সীমারেখা তো তাঁরা টানেননি। কিন্তু তাঁদেরই হল মহা বিপদ। ধর্মের নামে দেশ ভাগ হওয়ায়, ধর্মের নামেই মারামারি চলতে থাকে। সেই মারামারি শুরু হয়েছিল দেশভাগের আগে থেকেই। দেশভাগের পরেও তা মোটেও থামেনি। এই মারামারি বা দাঙ্গা থেকে বাঁচতে মানুষ সীমানা পেরোতে শুরু করেন। কে কোন দেশের মানুষ, সেই নিয়ে বিবাদ চলতে থাকে। পঞ্জাবে যেমন হিন্দু, মুসলমান আর শিখেরা সীমানা পেরোতে থাকেন, বাংলাতেও তাই। তবে পঞ্জাব আর বাংলা,

এই দুই জায়গায় যাতায়াত ছিল দুই ধরণের। পঞ্জাবে দেশভাগের সময়েই বেঁধেছিল তুমুল মারপিট। তাই প্রাণ বাঁচাতে মুসলমানরা পাকিস্তানের দিকে আর হিন্দু ও শিখেরা ভারতের দিকে রওনা হয়েছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। পঞ্জাবে উদ্বাস্তুদের যাতায়াত মোটামুটি ভাবে বলা যায় দেশভাগের পরের তিন বছরের মধ্যে থেমে গিয়েছিল। দু'দেশের সরকারই তাঁদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছিল যতটা সম্ভব। যেসব মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের পঞ্জাবে এসে পৌঁছেছিলেন, সরকার তাঁদের দায়িত্ব নিয়েছিল প্রথম থেকেই। এই সময়ে যে সমস্ত হিন্দু এবং শিখ এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের ভারতের নাগরিক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

বাংলার ক্ষেত্রে সরকার কিন্তু অন্যরকম পথ নিয়েছিল। বাংলায় হিন্দুরা এসেছিলেন পশ্চিম বাংলায়, আর মুসলমানরা চলে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে। নিজেদের বাড়ি বা বাস্তু হারানো উদ্বাস্তু মানুষের ঢল নেমেছিল সীমান্তের দুই দিকে। সরকার প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যে সকল মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে দেশভাগের এক বছরের মধ্যে চলে আসবেন, তাঁদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব নেওয়া হবে। তার পরে যাঁরা আসবেন, তাঁদের নয়। তাই একদম তারিখ বেঁধে বলে দেওয়া হল, যে ১৯৪৮-এর জুলাই মাস পর্যন্ত যাঁরা আসবেন, তাঁদের সরকার এ দেশের নাগরিক বলে মেনে নেবে। তার পরে এলে কিন্তু আলাদা করে নাম লেখাতে হবে। তাও লোক আসা-যাওয়া থামেনি। থামবেই বা কীকরে, ধর্মের নামে অশান্তি তো লেগেই ছিল! বাংলায় দেশভাগের অনেক বছর পরেও, দলে দলে উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন। এদিকে সরকার

এত মানুষকে বরাবরের মতো থাকতে দিতে নারাজ। তার মানে নাগরিকদের যে অধিকার থাকে, দেশের যেখানে খুশি থাকা, যাতায়াত করা, কাজকর্ম করা, রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করা, সেসব তাদের দেওয়া হল না। তাও মানুষ নানা ভাবে থেকে গিয়েছিলেন, কেউ কেউ নিজেরাই খুঁজে নিয়েছিলেন কাজ-কর্ম, বাড়ি-ঘর। আবার অনেক উদ্বাস্তু, যাঁদের কোনও টাকা পয়সা, সহায় সম্বল ছিল না, তাঁদের জন্য তৈরি হয়েছিল ক্যাম্প। উদ্বাস্তুরা যত ষ্টেশন চত্বরে, রাস্তা-ঘাটে ভিড় করেছিলেন, সরকার তত তাঁদের অনেক দূরের ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল।

এই ক্যাম্প বা শিবির একটা ঘেরা জায়গা যেখানে উদ্বাস্তুদের রাখা হত। সেখানে তাঁদের উপর সরকার নজর রাখত। তাঁদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা বিনা অনুমতিতে সেখান থেকে বেরোতে পারবেন না, বেরিয়ে কাজকর্ম করতে পারবেন না। তাঁদের জন্য ক্যাম্পের নানান নিয়ম আর বিধিনিষেধ তৈরি হয়েছিল। অনেক সময় পরিবারের যে ক'জন সীমানা পেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই একই ক্যাম্পে ঠাঁই পাননি। বিধবা বা অনাথ অবিবাহিত মেয়েদের জন্য তৈরি হয়েছিল আলাদা ক্যাম্প। আমাদের সমাজে প্রায়ই মেয়েদের কমজোরি আর দুর্বল ভাবা হয়। সরকারও খানিকটা সেরকমই ভেবেছিল। সরকার মনে করেছিল এই একা মেয়েরা নিজেদের দেখাশোনা করতে পারবেন না। সরকারের ওপর সারা জীবন নির্ভর করে থাকবেন তাঁরা। তাই তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এইসব মেয়েদের ক্যাম্পে বিধিনিষেধও অনেক রকমের। তাঁদের সঙ্গে যদি বাচ্চারা থাকে, তাদের জন্যও ছিল নানান নিয়ম। ছেলেরা

একটু বড় হলে এক সময় মায়ের ক্যাম্প থেকে সরিয়ে অন্য ক্যাম্পে রাখা হত। অল্প কিছু রোজগার করলেই পরিবারের ছেলেদের গোটা পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে, এমনটাই ঠিক হল। ক্যাম্পে ছেলেদের দেওয়া হত একরকম কাজ, মেয়েদের অন্যরকম। ভেবে দেখ, এক দেশের ভেতর অধিকারের কত রকমফের। এক সীমানার মধ্যে অন্য কত সীমানাও ঢুকে পড়ে। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এরকম - এক দেশের সীমানা পেরিয়ে আর এক দেশে ঢুকলেও আবার ক্যাম্পের সীমানায় আটকে পড়া। যেন একটা দেশের ভেতরে আর একটা দেশ। আবার সব উদ্বাস্তুদেরও কিন্তু একরকম ভাবে সরকার দেখাশোনা করত না মোটেই। একই দেশে একই সমস্যায় পড়া উদ্বাস্তু, কিন্তু তাঁদের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা।

জটিলতা কি একটা? অনেক সময় এমন হত যে কিছু মুসলমান এদেশে দাঙ্গা বাঁধতেই সীমানা পেরিয়ে পাকিস্তানে চলে যেতেন, আর তার পরে মারামারি একটু থামলে দেশে ফিরে আসতেন। একইভাবে অনেক হিন্দুও কখনও এই বাংলায় কখনও ঐ বাংলায় আশ্রয় খুঁজেছিলেন। এঁদের নিয়ে সরকার পড়ল মুশকিলে। এই মানুষগুলোকে নাগরিক হিসেবে জায়গা করে দিতে চাইল না কেউ। এঁদের নিয়ে নেতাদের মধ্যে ঘোর বিবাদ শুরু হল। একদল বলেন, একবার যখন দেশ ছেড়েছ, আর আগের মতো থাকতে পারবে না। অন্য এক দল তখন বলেন, দেশ তো আর তারা ইচ্ছে করে ছাড়েননি। লড়াই-দাঙ্গা লেগেছিল বলেই তো ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁদের সব বাড়ি ঘরদোর অন্য লোকে দখল করে নিয়েছে।

নিজের দেশে ফিরে এই মানুষগুলো পড়লেন মহা বিপদে। একেবারে লেখাপড়া করে না বললেও, সরকার তাদের ফেরত আনতে নিরুৎসাহী ছিল। মোটকথা, ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর ভারতীয়রা খাতায় কলমে নাগরিক হয়েছিল বটে, কিন্তু কে যে ভারতীয় আর কে নয়, তা নিয়ে বড়ই গোল বেঁধেছিল। আর এই গোলমালের মূলে ছিল সেই দেশভাগ, মারামারি আর প্রাণভয়ে মানুষের এদিক-ওদিক যাতায়াত।

Refugee Registration Card

Book No- ৭১১

Registration No - বি.৪১ Date - ৯/১১/৫০ Place- বনগাঁ

Name (Head of the family)- অজয় সেন Caste -

Present Address-
Village or town- PO- জোরপুর

Date of Departure - ৫/১০/৫০

Date of Arrival in Indian Union - ৭/১০/

Date of Reporting to any Govt. Camp - ৯/১১/৫০

Past Occupation মজুরি Present Occupation

Total Member in the Family - Name & Age

পার্বতী সেন ৩০ সেন ১২ সেন ৮

১৯৭১
নাগরিক
১৯৫৫
নাগরিক
১৯৬৬
নাগরিক
২০০৩
নাগরিক
১৯৮৬
নাগরিক
১৯৫০
নাগরিক

আইন-কানুন

এইসব হট্টগোলের মধ্যে সংবিধানের নিয়ম মেনে ১৯৫১-৫২ সালে কয়েক মাস ধরে স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল। মানুষ ভোট দিয়েছিলেন। তারপর ১৯৫৫তে চালু হয়েছিল নাগরিক আইন। তার মানে খাতায় কলমে স্বাধীন ভারতে নাগরিক আইন তৈরি হওয়ার আগেই কিন্তু ভোট দেওয়ার অধিকার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আর ভোট দেওয়ার অধিকার তো নাগরিকদেরই থাকে। মানে দাঁড়াচ্ছে যে আলাদা নাগরিক আইন চালু হওয়ার আগেও নাগরিক ছিলেন ভারতীয়রা। আইন মানেই সন তারিখ দিয়ে বলে দেওয়া কাদের সরকার নাগরিক বলবে, আর কাদের বলবে না। ১৯৫৫ সালের আইনে বলা হয়েছিল যে ভারতে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা ভারতের নাগরিক। ১৯৫৫র এই আইন কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকবার বদলানো হয়েছে। ১৯৮৬, ২০০৩, ২০০৫, ২০১৫, ২০১৯ সালে নতুন নতুন অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে এই আইনে। এত বদলের মধ্যে সরকার প্রতিবার নতুন করে ঠিক করেছে কাদের নাগরিক হিসেবে মানা হবে না। এই নিয়ম বদলের সময়ে প্রতিবার কিছু মানুষ বাদ পড়ে গেছেন। ১৯৮৬তে যেমন আইন একটু বদলে সরকার ঘোষণা করেছিল যে যাঁরা ১৯৫০এর ২৬শে জানুয়ারি থেকে ১৯৮৭র ১লা জুলাই-এর মধ্যে ভারতে জন্মেছেন বা জন্মাবেন, তাঁরা হবেন এ দেশের নাগরিক। তার পরে জন্ম হলে নিয়ম হবে অন্যরকম। তখন তাঁদের বাবা-মা কোন দেশের মানুষ তার উপর নির্ভর করবে তিনি নাগরিক নাকি নাগরিক নন।

আসলে ১৯৮৬ সালের আগে একটা বড়সড় পরিবর্তন হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্রে। ১৯৭১এ পাকিস্তান দেশটা আর একবার ভাগ হয়েছিল, জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের। এই ভাগাভাগির সময়ে দাঙ্গা, মারামারির জেরে আবার অনেক মানুষ সীমানা পেরিয়ে ভারতের পূর্ব দিকের রাজ্যগুলোতে আসতে শুরু করেন। আবার ঘরছাড়া হলেন অনেক মানুষ। এই যাতায়াতও থামেই না, বছরের পর বছর মানুষ সীমানা পারাপার করেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। আমাদের দেশের সরকার ভাবল এই যাতায়াতে রাশ টানা দরকার। সেই মতো তারা ঠিক করল যে বিভিন্ন সময়ে ভারতে যেসব মানুষ এসেছেন, তাঁদের সকলের বংশধরদের নাগরিকত্ব দেওয়া যাবে না। তাই ১৯৮৬ সালে খানিক পালটানো হয়েছিল ১৯৫৫ সালের আইন। আবার অসমের ক্ষেত্রে ছিল আলাদা নানা নিয়ম। সে কথা পরে বলছি।

২০০৩এ আবার আইন বদলাল। এবার বলা হল, যাঁরা ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০০৪এর পরে জন্মাবেন, তাঁদের নাগরিক হতে গেলে বাবা মা দুজনকেই ভারতীয় হতে হবে। তা যদি না হয় তাহলে অন্তত একজনকে ভারতীয় হতে হবে, আর দেখতে হবে অন্যজন যেন কোনভাবেই অনুপ্রবেশকারী না হন। কারা এই অনুপ্রবেশকারী? সেটা বুঝতে একটু পিছিয়ে গিয়ে দেশভাগের সময়ে পৌঁছে যাই আর একবার। তারপর আবার ফিরব আইন বদলের কথায়।

অনুপ্রবেশকারী

দেশভাগের আগে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান ছিল না। তাই তখন মানুষ ব্রিটিশ ভারতের ভেতর যে কোনও জায়গায় যখন খুশি যেতে পারতেন। দেশভাগের পরে এমন সহজ চলাচল বন্ধ হল। সীমানার দুই দিকের মানুষ একে অপরের কাছে বিদেশি হয়ে গেলেন। কিন্তু এই সীমানার একেবারে কাছে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা অনেকেই আগের মতোই যাতায়াত করার চেষ্টা করতেন। কী করবেন, বন্ধু-বান্ধব, বাজার-হাট অনেককিছুই যে সীমানার ওপারে পড়েছে। এদিকে আগেই বলেছি, দাঙ্গার জেরে মানুষ সীমানা পেরিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশ যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রথমদিকে সরকার মনে করেছিল, এরকম বেশিদিন চলবে না। কিন্তু দেখা গেল বর্ডার পেরিয়ে মানুষ আসছেন তো আসছেনই। সব থেকে গোলযোগ বেঁধেছিল সেইসব মুসলমানদের নিয়ে যাঁরা ভারত থেকে দেশভাগের সময়ে লড়াই-মারামারির জেরে চলে গিয়েছিলেন পাকিস্তানে আর তারপর নানা কারণে আবার ফিরে এসেছিলেন ভারতে। এরকম মুসলমানদের সরকার কিন্তু প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছিল। তাঁরা শুধু কাজের খোঁজে বা নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসার জন্যই সীমানা পেরোচ্ছেন নাকি পাকিস্তানের চর হয়ে দেশে ঢুকে পড়ছেন, মন্ত্রী-আমলাদের সেই নিয়ে ভারী ভাবনা ছিল। তাই সীমানা পেরিয়ে আসা সব মুসলমানই ভারত সরকারের চোখে সন্দেহজনক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের অনেককেই সরকার কাগজে কলমে নাগরিক হিসাবে স্বীকার করেনি।

তাঁরা তো উদ্বাস্তুও নন, তাঁরা যে নিজের দেশেই ফিরছেন। এই মানুষগুলো সরকারি চোখে বে-আইনি মানুষ হয়ে গেলেন। সরকারি ভাষায় এরা অনুপ্রবেশকারী — মানে যারা অন্য দেশ থেকে এসেছেন কিন্তু না তারা উদ্বাস্তু, না তাদের আছে এই দেশে ঢোকার কোনো অনুমতি। সরকারের মতে তাদের ভারতে ঢোকাই অন্যায়। তাদের ধরতে পারলে সরকার শাস্তি দিত, ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করত।

কিছু কিছু জায়গায় ঘটেছিল আর এক বিপদ। পূর্ব বাংলা থেকে বর্ডার পেরিয়ে যখন উদ্বাস্তুরা এসে থাকতে শুরু করলেন ভারতে, যেখানে তাঁরা ঠাঁই নিলেন, সেখানকার অনেক মানুষের রাগ হল। তাঁদের ভয় হল যে উদ্বাস্তুরা তাঁদের জমি জায়গা দখল করে নেবেন। যেমন ধরো, ত্রিপুরায় কোনও কোনও জায়গায় বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুরা এসে সেখানকার আদি বাসিন্দাদের সরিয়ে দিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন। ত্রিপুরায় কিন্তু কেবল দেশভাগের পরে নয়, তার আগেও সেই ব্রিটিশ আমলেও এমন হয়েছে। এই রাজ্যে নানা সময়ে বাঙালিরা আদি বাসিন্দাদের সরিয়ে দিয়ে নিজেদের ঘর বাড়ি বানিয়েছিলেন। বাঙালিরা লেখাপড়ায় এগিয়ে ছিলেন, তাই ব্রিটিশ সরকার তাঁদের কাজে লাগাতে পারতো। তাই সরকার তাঁদের সরাতে চাইত না। ফলে বাঙালিদের উপর রাগ ছিল ওখানকার আদি বাসিন্দাদের বরাবরই। দেশভাগের পর যখন দলে দলে হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তু আসা শুরু করলেন, তখন নতুন সরকার এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছিল। আদি বাসিন্দারা রেগে গেলে ভোটে জেতা মুশকিল, তাই সরকার

নিয়ম-কানুন করে উদ্বাস্তুদের আসা বন্ধ করার চেষ্টা করল। কাউকে কাউকে বলা হল যে তাঁদের এদেশে আসাটা বেআইনি হয়েছে। তখন তারাও হল 'অনুপ্রবেশকারী', মানে যাঁরা জোর করে, নিয়ম ভেঙে ঢুকে পড়েছে। শুধু ত্রিপুরা নয়, সীমানা বরাবর সব রাজ্যেই কে অনুপ্রবেশকারী তা নিয়ে সরকার আর সেখানকার অনেক লোকের ভারি মাথাব্যাথা। আমাদের পশ্চিম বাংলা, অসম, সব রাজ্যেই প্রায়ই শোনা যায় এই শব্দটা।

অনুপ্রবেশকারীরা কিন্তু উদ্বাস্তুদের থেকে আলাদা। সরকার উদ্বাস্তু বলে কাউকে স্বীকার করলে তাঁদের থাকা খাওয়ার কিছু ব্যবস্থা করত। কিন্তু যাঁদের উদ্বাস্তু বলেও মানা হল না, তাঁদের ফেরত পাঠানো বা শাস্তির কথা ভাবা হল তারা অনুপ্রবেশকারী এই ভেবে। আমাদের দেশের ইতিহাস পড়লে দেখবে এই বর্ডার টানার ফলে নাগরিকদের অধিকার কীভাবে মাঝে মাঝেই হারিয়ে যায়। যে ছিল এ দেশেরই মানুষ, সে হয়ে ওঠে অনুপ্রবেশকারী।

We are all
Indians

নাগরিক আইন ২০১৯ বা CAA

২০১৯ সালে আরও একবার সরকার নাগরিক আইন বদলের কথা বলল। আইনের রকমফের করারও কিন্তু একটা নিয়ম আছে। আইন তৈরি বা বদল করা হয় দেশের সংসদে বা নানা রাজ্যের বিধানসভায়। প্রথমে বদলের প্রস্তাব তৈরি হয়, যাকে বলা হয় বিল (bill)। তারপর বেশিরভাগ সদস্য সেই প্রস্তাব মেনে নিলে তখন সেটা আইন বা Act হয়। এরকম একটা বিলকেই ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের সংসদে আইনে পরিণত করা হল। এই আইনের নাম Citizenship (Amendment) Act, বা ছোট করে CAA। শব্দগুলো খটমট হলেও, মানে কিন্তু সহজ। Citizenship মানে নাগরিকত্ব, amendment মানে সংশোধন বা রদবদল। এই আইনে বলা হল ৬টা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ যদি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৪র মধ্যে ভারতে এসে বসবাস শুরু করে থাকেন, তাহলে তাঁদেরকে নাগরিক হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। এই ৬টি ধর্মীয় গোষ্ঠী হল হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি আর খ্রিস্টান। তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ এই ভেবে যে কেবল তিনটে দেশের কথাই বলা হল কেন, আর মুসলমানদের কথা বলা হল না কেন? অবাক হওয়ারই কথা, আর অনেকেই অবাক হলেনও খুব। তাদের প্রশ্নের উত্তরে সরকার জানাল যে যেহেতু এই দেশগুলোতে বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান, তাই অন্যান্য ধর্মের মানুষ দাঙ্গা-মারামারির

ভয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছেন। আর মুসলমানদের এরকম কোনও ভয় নেই। এই যুক্তি দেখিয়ে সরকার বলল, মুসলমানদের প্রাণের ভয় না থাকলে সীমানা পেরোনোর কেনই বা দরকার পড়বে? কিন্তু এই কথাটা তো পুরোপুরি ঠিক নয়। সীমানা পেরোনোর নানা কারণ থাকতে পারে —যেমন ধরো বন্যা, ঝড়, খরা। আবার মুসলমান যে দেশে বেশি সে দেশে কোনো মুসলমানের প্রাণের ভয় নেই তাও নয়। মুসলমান সমাজেও নানা ভাগ আছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা আফগানিস্তানে শিয়া মুসলমান বা অহমদিয়া মুসলমানদের উপর সংখ্যায় বেশী সুন্নি মুসলমানরা অনেক সময়েই অত্যাচার করেছে। আবার ভারতের আর এক প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার। সেখানে দাঙ্গার জেরে অনেক মুসলমান সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন, কিছু মানুষ ভারতেও এসেছেন। তাই, শুধু তিনটে দেশ আর ছ'টা ধর্মীয় গোষ্ঠীর কথা বলা যে ঠিক নয়, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। আসলে সেই দেশভাগের সময় থেকেই যে মুসলমানদের সন্দেহ করার অভ্যাস এদেশের সরকারের! এই আইনও সেই সন্দেহ থেকেই লেখা।

২০১৯এর আইন পাস হওয়ার পরে ভারতের মুসলমানদের মনেও ভয় ঢুকল। তাদের মনে হল নতুন নাগরিক আইন অনুযায়ী যদি তাঁরা নিজেদের কাগজপত্র, বাবা-মায়ের কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ এইসব দেখাতে না পারেন, তাহলে তাঁদের কী হবে? তারা যে নাগরিক, অনুপ্রবেশকারী নয়, এ কথা কী করে তারা বোঝাবেন? আমাদের কতজনেরই বা এতসব

পুরনো কাগজপত্র যত্ন করে রাখা থাকে? আমাদের দেশে যে এত মুসলমান এত বছর ধরে আছেন, হতেই পারে তাঁদের কারও হয়তো বাবা-মা আর বেঁচে নেই, বা তাঁদের জন্ম-মৃত্যুর কাগজ কিছুই রাখা নেই। তাঁরা এখন কী ভাবে প্রমাণ করবেন যে তাঁরা এ দেশের নাগরিক, বাইরে থেকে আসেন নি? ভয় হল তাঁদের খুব, কাগজ না দেখাতে পারলে যদি দেশ থেকে চলে যেতে বলা হয়? দেশের আরও বহু মানুষেরই মনে হল এ খুব অন্যায় নিয়ম, এমন নিয়ম মানা উচিত নয়।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হল আন্দোলন, শুরু হল লড়াই। ছাত্র-ছাত্রী, সব বয়সের সাধারণ মানুষ, সকলেই আন্দোলনে যোগ দিলেন। দিল্লির শাহীন বাগ বলে এক জায়গায় ডিসেম্বরের কড়া শীতের মধ্যেই এক দল মহিলা আন্দোলন শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে অনেক বয়স্ক মহিলাও ছিলেন, যেমন বিলকিস দাদি। দাদির বয়স প্রায় ৮২। শীত কিন্তু দাদিকে কাবু করতে পারেনি। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে এই কাজ তিনি তাঁর পরের প্রজন্মের জন্য করছেন। ভয় পেলে তো চলবে না। দাদি অন্য অনেকের মতোই তাঁবু খাটিয়ে থাকতে শুরু করলেন শাহীন বাগেই। সেখান থেকে তাঁকে নড়ানো যায় না। দাদি বললেন ঝাঁসির রানী যেমন নির্ভয়ে লড়াই করে গিয়েছিলেন, তিনিও করবেন। ২৬ শে জানুয়ারী, আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন, দাদি অন্য অনেকের সঙ্গে ভারতের পতাকা

তুললেন। প্রজাতন্ত্রে সকল নাগরিকদের যে সমান অধিকার থাকার কথা, আর তা কেড়ে নেওয়া যে কোনও সরকারেরই উচিত নয়, সে কথাই দাদি এবং অন্যান্যরা বোঝাতে চাইলেন।

সাল	কী বলা হল
১৯৫৫	● ভারতে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা ভারতের নাগরিক ● দেশের বাইরে জন্মালেও, মা-বাবা ভারতীয় হলে দেশের নাগরিক হওয়া যাবে ● পারিবারিক সূত্রে ভারতীয় হলে, সরকারের কাছে আবেদন করা যাবে নাগরিক হওয়ার জন্য ● অন্য দেশের মানুষ, যাঁরা অনুপ্রবেশকারী নন, দেশে অনেক বছর বসবাস করলে নাগরিক হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।
১৯৮৬	যাঁরা ১৯৫০ এর ২৬শে জানুয়ারি থেকে ১৯৮৭র ১লা জুলাইয়ের মধ্যে এ দেশে জন্মেছেন বা জন্মাবেন, তাঁরা ভারতের নাগরিক।
২০০৩	যাঁরা ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০০৪ এর পরে জন্মাবেন, তাঁদের নাগরিক হতে গেলে হয় বাবা মা দুজনকেই ভারতীয় হতে হবে, নাহলে একজনকে ভারতীয় হতে হবে আর অন্য জন যেন কোনওভাবেই অনুপ্রবেশকারী না হয়, সেটা দেখতে হবে।
২০০৫	অসমে বসবাস করা অন্য দেশের মানুষদের নাগরিক বলা যাবে কিনা, সেটা

	এখন থেকে বিদেশীদের জন্য যে বিশেষ আইন আছে, যার নাম Foreigners Act, 1946 এবং Foreigners (Tribunals) Order, 1964, তার দ্বারা বিবেচনা করা হবে।
২০১৫	দেশের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে কাদের নাগরিক হিসাবে মেনে নেওয়া হবে, সেই সংক্রান্ত নিয়ম করা হল।
২০১৯	Citizenship (Amendment) Act চালু করা হল।

জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা NRC

CAA নিয়ে যখন সারা দেশে খুব হৈহৈ, তখন আরেকটা শব্দও খুব শোনা যেতে শুরু করল। সেই শব্দটা হল NRC বা National Register of Citizens। এটা একরকম তালিকা যা ২০০৩ সালে অসমে তৈরি করার কথা হয়। সেই বছর যখন নাগরিক আইন সংশোধন করা হল, তখনই সরকার বলল যে, অসমের জন্য এরকম একটা তালিকা তৈরি করতে হবে যাতে বোঝা যাবে কারা নাগরিক আর কারা নন। কাজ শুরু করতে করতে বেশ ক'বছর কেটে গেল, কোথাও কোথাও শুরু হওয়ার পর মানুষের আপত্তিতে থমকে গেল সেই কাজ। অবশেষে ২০১৩ সালে সেই তালিকার কাজ পাকাপাকি শুরু হল আর ২০১৯এ সেটা বেরোল।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, অসমে এরকম বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হল কেন? সে কথা বলছি। কিন্তু তার আগে বলে নিই এই নাগরিকদের লিস্ট বা রেজিস্টারের কথা। যখন CAA নিয়ে খুব শোরগোল চলছে, সরকার বলতে শুরু করল যে, সারা দেশেই এরকম তালিকা তৈরি করতে হবে। ২০১৯এ যখন অসমে তালিকা প্রকাশ পেল, তখন দেখা গেল অনেক মানুষ সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন মুসলমান, তেমন আছেন হিন্দুরাও। যে দেশে, যে জায়গায় তাঁরা কয়েক প্রজন্ম ধরে থেকেছেন, হঠাৎ করে তাঁরা আর সেখানকার লোক নন, এরকম বলা হল। নাগরিকের কোনও অধিকারই আর তাঁদের রইল না। বলতে পারো, তাঁদের কোনও দেশই রইল না। ভেবে দেখ, যে দেশে নাগরিক হিসেবে থাকার আমার অধিকার নেই, সে দেশ কি

আর আমার নিজের হতে পারে? এদিকে তাঁরা তো অন্য কোনও দেশের নাগরিকও নন। এবার ভেবে দেখ, এই ব্যবস্থা যদি গোটা দেশেই চালু হয়, তাহলে আরও কত মানুষ বিপদে পড়বেন।

এখানে তোমাদের একটু বলে রাখি এই তালিকা তৈরি করার পদ্ধতি কেমন। এই NRC তৈরি হয় আর একটা তালিকার ভিত্তিতে, যাকে বলা হয় National Population Register (NPR)। নাম থেকেই বুঝতে পারবে দুটো দুরকম তালিকা। এই NPR লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তৈরি করা হয়। এই তালিকায় নাগরিকের নাম থাকে, আবার যাঁদের সরকার নাগরিক বলে মানবে না, তাঁদেরও নাম থাকে। সহজ কথায় জনসংখ্যা বা Population বলতে বোঝায় দেশের সকল মানুষ, তা সে নাগরিক হন বা বিদেশি। এবার এর থেকেই বেছে আলাদা করে, কাগজপত্র মিলিয়ে, শুধু নাগরিকদের যে তালিকা তৈরি করার কথা বলা হল, সেটারই নাম হল NRC বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি। CAA নিয়ে যখন দেশে সবাই ভয়ে কাঁটা, তখন দেশ জুড়ে সরকার নতুন করে NPR, আর তার ভিত্তিতে NRC তৈরি করার কথা বলল। তার মানে অসমে যেমন হয়েছে তেমন সারা দেশে তালিকা হবে, সেই তালিকায় সকলের নাম, বাবা-মায়ের নাম, তাঁরা কোথাকার বাসিন্দা, সব থাকবে। এতসব কাগজপত্র না থাকলে তো বিপদ! তখন যাঁদের কাগজ থাকবে না, তাঁদের নাগরিকত্ব সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। সে জন্যই বিলকিস দাদির মতো যাঁরা বললেন CAA চাই না, তাঁরা পাশাপাশি NRC আর NPR চাই না বলেও আন্দোলন করলেন।

অসম

১৯৭১-এ পাকিস্তান দেশটা ভেঙে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তার আগে কিছুদিন ধরে চলেছিল পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে লড়াই। পূর্বের মানুষ নিজেদের আলাদা দেশ চাইছিলেন। এই গন্ডগোলের সময় অনেক মানুষ ঘরবাড়ি হারালেন। এই বাস্তুহারা মানুষজন অনেকেই অসমে এসে পৌঁছলেন। কেন এলেন, সে তোমরা মানচিত্র দেখলেই বুঝতে পারবে। সীমানা পেরিয়েই কাছাকাছির মধ্যে পড়ত অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলো। তাই পৌঁছনো সহজ। তাছাড়া অনেকেরই চেনাপরিচিত কেউ না কেউ হয়ত থাকতেন অসমে, সেই সুতো ধরে তাঁরা চলে আসেন।

তোমাদের এখানে বলে রাখি যে, আমাদের দেশে দশ বছর পরপর মানুষ গুনে তালিকা তৈরি করার চল সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই আছে। একে বলা হয় Census বা জনগণনা। কত লোক, কে কোন ভাষায় কথা বলেন, কার কী পেশা, কে গ্রামে থাকেন কে শহরে, কার কোন জাতি বা বর্ণ — এইসব জানা যায় এই তালিকা থেকে। ১৯৫১ সালে দেশজুড়ে এরকম গোনাগুন্তি হয়েছিল। সেই তালিকার ভিত্তিতে অসমে তখনই একটা নাগরিকদের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। ব্রিটিশ আমল থেকেই আসলে অসমের মানুষদের ভয় যে

বাইরে থেকে লোক এসে তাঁদের জমি-জমা, চাকরি সব নিয়ে নেবেন। বিশেষ করে তাঁদের ছিল বাঙালিদের নিয়ে চিন্তা। শিক্ষিত বাঙালিরা চাকরি নিয়ে নেবে আর বাঙালি চাষি নিয়ে নেবে জমি, এই আশঙ্কা অসমীয়া সমাজে পুরনো। দেশভাগের সময়ে যখন পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু আসতে শুরু করলেন অসমে, এই চিন্তা আবার বাড়ল। তাই অসমে শুরু হল এই তালিকা তৈরির তোড়জোড়। কিন্তু সে তালিকা খুব বেশিদিন চালু রাখা হয়নি। এবার, ১৯৭১এর পর থেকে আবার সেই তালিকার কথা উঠল। এই তালিকার ভিত্তিতেই তো সরকার ঠিক করে ফেলবে এখন কাদের নাগরিক বলা হবে আর কাদের বলা হবে অনুপ্রবেশকারী। আগে যা বললাম, তেমনই আবার, নতুন তালিকা, নতুন নিয়ম মানেই কিছু মানুষের নাগরিক তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া। আর হলও ঠিক তেমনই। কিন্তু তালিকা তৈরির কাজ তো আর একদিনের কাজ নয়। কাজ শুরু হতে দেরি হয়, আর এদিকে সীমানা পেরিয়ে যাঁরা সেই ১৯৭১এ এসেছিলেন, তাঁরা ততদিনে অনেক বছর ধরে অসমে থাকছেন, ছেলে-মেয়ে ঘর-সংসার নিয়ে।

এইসব নিয়ে ১৯৮০র দশকে অসমে ঘোর গণ্ডগোল বাঁধল। এক দল ছাত্র-ছাত্রী আন্দোলন করতে শুরু করলেন এই বলে যে অন্য দেশ থেকে আসা মানুষজনদের কিছুতেই অসমে জায়গা করে দেওয়া যাবে না। তাঁরা দাবি করলেন যে এদের সকলকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে

হবে। সরকার এই অবস্থায় কী করল বল দেখি? একদিকে সরকার ভাবছে এতজন মানুষকে যদি ভোটের অধিকার দেওয়া যায়, তাহলে তাঁরা সব খুশি হয়ে আমাদেরই ভোট দেবেন, আবার ওদিকে এমন গণ্ডগোল শুরু হয়েছে যে কিছু না করলেই নয়। তখন সরকার ১৯৮৩ তে আইন করে বলল যে অসমের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারা বিদেশি সেটা বিচার করে দেখতে হবে। সকলে নাগরিক হিসেবে থেকে যেতে পারবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে পাশের বাড়ি বা পাড়ার লোকজনের কথা শোনা হবে। তারা যদি নালিশ করে, তাহলে সমস্যা। নাহলে নয়। যাঁরা এতবছর ধরে পাড়ায় থেকেছে, একসাথে কত কাজ-কারবার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কি আর কেউ সহজে নালিশ করে? তাই আসলে হল কী, এভাবে বিচারে তেমন কাউকেই বাদ দেওয়া হল না। সব দিকই মোটামুটি রক্ষা করার চেষ্টা করা হল।

কিন্তু এত বছরের এতরকম অভাব-অভিযোগ কি আর সহজে মিটিয়ে ফেলা যায়? যাঁদের খালি এমন সন্দেহ যে অসমে বাইরের মানুষ ঢুকে পড়ছেন, তাঁরা সহজে লড়াই থামাতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা তখনও বলে চললেন যে অসমে থাকার অধিকার কেবল তাঁদেরই আছে। অন্যরা বহিরাগত; বাইরে থেকে এসেছেন। তাঁদের ফিরে যেতে হবে। তাই এই মানুষগুলোকে নিয়ে টানাটানি চলতেই থাকে। ১৯৮৩র আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনও

চলতে থাকে। কোর্ট-কাছারি, মামলা-মোকদ্দমাও শুরু হয়। ২০০৫ সালে কোর্ট থেকে বলা হয়, এই আইন চলবে না। হরেক আইন করেও সমস্যা মেটে না। ইতিমধ্যে সরকারও বদল হয়। শেষমেষ ২০১৩ সালে তালিকা তৈরি শুরু হল আর ২০১৯এর ৩১শে আগস্ট নাগরিকদের নতুন তালিকা বেরোল। এটাই সেই NRC, যার কথা একটু আগেই তোমরা পড়লে। অসম প্রদেশে অনেক বছর ধরেই যেহেতু কারা নাগরিক আর কারা বাইরে থেকে আসা মানুষ, এই নিয়ে সমস্যা ছিল, তাই সেখানেই এই তালিকা তৈরি করার কথা হল। সেই NRC তালিকায় কত মানুষ যে বাদ পড়লেন, সে আর বলার নয়! এবার ভেবে দেখ, যাঁরা বাদ পড়লেন তালিকা থেকে, তাঁরা তো আর তাঁদের নিজের দেশে নাগরিক হিসেবে থাকতেই পারবেন না। তাঁরা নিজের দেশেই হয়ে উঠলেন বিদেশি। সরকার বলে দিল যে তালিকা থেকে যাঁরা বাদ, তাঁরা এ দেশের নাগরিক নন। তার মানে এই বাদ পড়া মানুষগুলো সরকারের চোখে হয়ে উঠলেন অনুপ্রবেশকারী, অর্থাৎ বে-আইনি ভাবে ঢুকে পড়া মানুষ। তাঁদের আর স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করার অধিকার রইল না। আর তখন তাঁদের জন্য কোনও একটা জায়গা ঘিরে সরকার তৈরি করল এক রকম ক্যাম্প। এই ক্যাম্প এর নাম detention camp বা বন্দি শিবির, মানে যেখানে তাদের আটকে রাখা যাবে বা detain করা যাবে। আগে যে উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পের কথা পড়েছ, এই ক্যাম্প কিন্তু তার

থেকে আলাদা। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে মানুষ আশ্রয় পেয়েছিলেন, সাহায্য পেয়েছিলেন, তা যত অল্পই হোক। আর ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া ছিল বে-আইনি মানুষকে শাস্তি দেওয়া। এরকম ডিটেনশন ক্যাম্প অসমে তো বটেই, তা ছাড়াও দিল্লি, গোয়া, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, রাজস্থানেও তৈরি করা হচ্ছে।

গঙ্গাধরের কথা

এসব তো হল আইনের কথা। বুঝতেই পারছ, সরকার কতরকম নিয়ম তৈরি করে, কিন্তু তাতে সমস্যায় পড়ে সাধারণ মানুষ! সেরকমই বিষম সমস্যায় পড়েছিলেন গঙ্গাধর প্রামাণিক। গঙ্গাধর প্রামাণিকের বাড়ি বাঁকুড়ার রাধানগরে। সেখান থেকে তিনি কাজের খোঁজে গিয়েছিলেন অসম। তা সে কাজের খোঁজে লোকে কত দূরেই তো পাড়ি দেয়, তাতে আর ঝামেলা কিসের? একটা হোটেলে তিনি কাজ করেন আর ভাবেন একটু টাকা জমিয়েই বাড়িতে পাঠাবেন। এদিকে অসমের সরকার তাঁকে বিদেশি সন্দেহ করে কাগজপত্র দেখাতে বলল। কিন্তু সেই কবে নিজের গ্রাম ছেড়ে অসমে এসেছেন গঙ্গাধর, সে সংক্রান্ত কাগজ তো আর কিছু ছিল না তাঁর কাছে। কাগজ দেখাতে পারছে না বলে সরকার ভেবে বসল, গঙ্গাধর এ দেশের নাগরিক নয়। তাঁকে বিদেশি বলে ধরে নিয়ে যাওয়া হল ক্যাম্পে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এক দেশের নাগরিকদের অন্য দেশে আসতে গেলে অনেক কাগজপত্র লাগে — পাসপোর্ট, ভিসা, এসব ছাড়া তাঁদের আসার, থাকার জো নেই। তিনি কোন দেশের মানুষ, তা জানাতে হয়, ছাড়পত্র, প্রমাণপত্র, এসব লাগে। কিন্তু দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে কি কাগজ লাগে? তোমরাও নিশ্চয়ই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম, এক শহর থেকে অন্য শহরে গিয়েছ। তার জন্য কি কাগজ দেখাতে হয়েছে কোথাও? বিদেশে গেলে দেখাতে হত নিশ্চয়ই।

কিন্তু গঙ্গাধর পড়লেন বিপদে। লোকজন মনে করলেন, তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। আর সেখান থেকে ছাড়পত্র ছাড়াই এসেছেন। গঙ্গাধরের কথা কেউ শোনে না। গঙ্গাধর কীভাবে প্রমাণ করবেন যে তিনি ভারতের নাগরিক? কাগজপত্র নিয়ে তো তিনি বাড়ি থেকে বেরোননি। কাগজ লাগবে, তিনি ভাবেননি। কাগজপত্র থাকে নাকি সকলের? জন্ম থেকে এক জায়গায় থাকছেন, গঙ্গাধর ভেবেছেন তাই যথেষ্ট। কিন্তু দেখা গেল গঙ্গাধর প্রামাণিক নিজের দেশেই যেন বিদেশি হয়ে গেলেন। অসমের গোয়ালপাড়ার ক্যাম্পেই তাঁর দিন কাটে। গঙ্গাধর ভাবেন তাঁর বোধহয় আর বাড়ি ফেরা হবে না। অবশেষে চার বছর পরে তাঁর খোঁজ পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করলেন কিছু উপকারী মানুষ। তারপর অনেক কাণ্ডকারখানা করে তাঁকে তাঁর বাড়ি ফেরত পাঠানো গেল। তাই আমাদের আবার বুঝে নিতে হবে যে সব নাগরিকদের সমান অধিকার সবসময় থাকে না। নিয়মের নাম করে অনেক সময়েই সরকার হেনস্থা করে গরীব মানুষকে, আর বিশেষ করে সে যদি গঙ্গাধরের মতো কাজের খোঁজে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো মানুষ হয়।

হাসিনা ভানু

এভাবে কাগজপত্রের ঝামেলায় পড়ে যান বহু মানুষ। তাঁদের বাংলাদেশ থেকে বে-আইনি ভাবে আসা মানুষ ভেবে ফেলা হয়, আর বছরের পর বছর তাঁদের কেটে যায় তাঁরা যে এ দেশের নাগরিক, সেটা বোঝানোর চেষ্টায়। গঙ্গাধরের কথা তোমরা পড়লে। দেখলে চার বছর তাঁর কেমন কেটেছিল। এবার বলি হাসিনা ভানুর কথা। তিনি অসমেরই বাসিন্দা। কিন্তু অনেকের মতোই তিনি বিদেশি কিনা, সেই সন্দেহের শিকার হতে হয়েছিল তাঁকেও। অসমে এরকম যাঁদের সন্দেহ করা হয়, তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে কিনা, সেটা একটা ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ শুধু নাগরিকদেরই ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে। তাই যাঁদের নিয়ে সন্দেহ তাঁদের বলা হয় ডি-ভোটার (D-voter) বা 'doubtful voter'। মানে, যাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকার নিয়ে doubt বা সন্দেহ আছে। এভাবেই সন্দেহের তালিকায় ঢুকে পড়েন হাসিনা ভানু। তাঁকে নিয়ে প্রথম প্রশ্ন ওঠে সেই ১৯৯৭তে। তখন তিনি সব কাগজপত্র জমা করেন। তাতে শুধু নিজেরই নয়, তাঁর বাপ-ঠাকুরদারও ভোটের কাগজ ছিল। এইসব কাগজপত্রের ভিত্তিতে ২০১৬ সালে তাঁকে নাগরিক বলে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু তার পাঁচ বছর পর অসমের সীমান্ত পুলিশ আবার তাঁকে সন্দেহ করতে শুরু করে।

আবার নতুন করে তাঁকে বিদেশি বলা হয়, আর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। তেজপুর জেলের এক অংশে সেই ক্যাম্প। সেখানে এরকম আরও অনেক মানুষকে ধরে রাখা হয়। তাঁদের সঙ্গে হাসিনাও প্রায় দু মাস বাড়িঘর ছেড়ে কাটান। তাঁর শরীর খারাপ, মন চিন্তায় অস্থির। অবশেষে তাঁর কাগজপত্র পাওয়া যায় আর তা দেখে বোঝা যায় যে তিনি অসমের বড়পেটা জেলায় জন্মেছেন। তাঁর বাবার সঙ্গে সেই ছোটবেলাতেই তিনি দলগাঁও জেলায় চলে আসেন আর সেখানেই পরে আয়েন আলির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের ছেলেমেয়ে ছ-জন। বোঝা যায় যে তিনি অসমেরই মানুষ। তারপর তাঁর ছুটি হয়। কিন্তু সেই ভয়ের দিনগুলো কি আর হাসিনা ভুলতে পারেন? তাঁর শরীর-মন আর সুস্থ হয় না। তিনি তাঁর সমস্ত কাগজপত্র এখন সাবধানে আগলে রাখেন। বাড়ির কোনও কাজ করার শক্তি আর তাঁর নেই। তাঁর ছেলে আব্বাস আলির বয়স সবে আঠারো। কিন্তু মা অসুস্থ বলে সব কাজের দায়িত্ব এখন তার। আব্বাস বেঙ্গালুরুতে কাজ করতে গেছিল। কিন্তু যখন জানতে পারে যে মা কে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখন সে সব ফেলে বাড়িতে ফিরে এসে সব সামলাতে থাকে।

গঙ্গাধর আর হাসিনার কথা পড়ে তোমরা বুঝতেই পারছ, কিছু কিছু মানুষকে নাগরিক হতে গেলে অনেক সময় কত লড়াই করতে হয়, কত বছর ধরে সেই লড়াই চলে। এই লড়াইটা

বিশেষ ভাবে বোঝা যায় দেশের সীমানার আশপাশের এলাকায়। অনেক সময় সেখানে যা চলে, তার খবর দেশের অন্যান্য জায়গায় পৌঁছয় না। এই বর্ডার এলাকার হাল-হকিকত তাহলে একবার দেখে নিই চল।

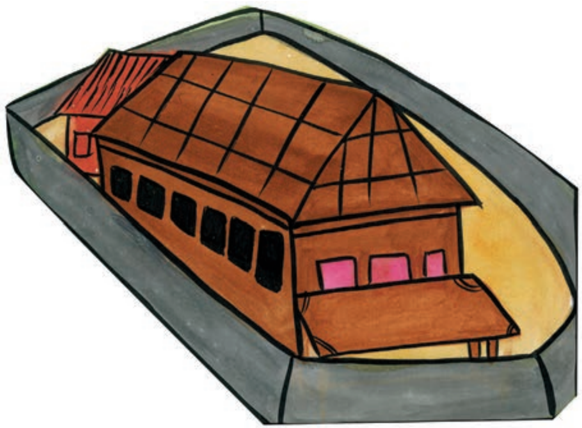

বর্ডার

দুটো দেশের মধ্যে সীমারেখা যখন টানা হয়, সেই সীমারেখা পেরোনোর জন্য বিশেষ অনুমতি নিতে হয়, সে কথা তোমরা জানো। সেই অনুমতি মানুষের যাতায়াতের জন্য যেমন লাগে, জিনিসপত্রের বেচা-কেনার জন্যও লাগে। দেশের নেতাব্যক্তিদের একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায় এই কেনা-বেচা যাতে তাঁদের সুবিধা অনুযায়ী চলে, সেটা দেখা আর সে কথা মাথায় রেখে রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা করা। তার জন্য অনেক পরিকল্পনা করতে হয়। ভারত-পাকিস্তান যখন দুটো দেশ হয়ে গেল, তখন নতুন বাণিজ্য পরিকল্পনাও করতে হল। একই ভাবে পাকিস্তান-বাংলাদেশ যখন দুটো আলাদা দেশ হল, তখনও এমনটাই করতে হয়েছিল। কিন্তু যখনই দুই দেশের মধ্যে ঝামেলা হয়, বাণিজ্য নিয়েও শুরু হয় টানাটানি। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে ঝগড়া বাঁধলেই, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যে সমস্যা শুরু হয়। দুই দেশই মনে করে এই বর্ডারে যদি জোর ফলানো যায়, তাহলে অন্য দেশকে বেশ উচিৎ শিক্ষা দেওয়া যাবে। জোর ফলাব বললেই কিন্তু তা করা যায় না। দেশের নেতারা কখন কী ঠিক করেন সে খবর সময়মতো বর্ডারে এসেই পৌঁছয় না সবসময়। বর্ডার টানেন তো দেশের নেতারা। কিন্তু ভেবে দেখ, হঠাৎ করে এমন লাইন টানলে হবে কী? পথঘাট, নদীনালা সব তো আগের মতো। যেমন ধরো, আমাদের দেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত। সেই পাহাড়েও তো সীমারেখা টানা হল। তাই নিয়ে ভারতের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান আর চীনের সঙ্গে সমস্যা চলতেই

থাকে। এ বলে এই অংশটা আমার, ও বলে ওই টুকরোটা আমার। এই ঝগড়ার শেষ নেই। এত সব লড়াই-ঝামেলার মধ্যে বুঝতে হবে বর্ডারের আশপাশে থাকা মানুষজন তাদের রোজকার জীবনে কেমন সমস্যায় পড়েন।

দেশের বর্ডার টানার সময় হয় কী, এক দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জিনিস পাঠানোর জন্য ছোট রাস্তাটা হয়তো দেখা গেল অন্য দেশের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। তখন দুই দেশের মধ্যে সইসাবুদ হয়, যাতে সেইটুকু পথ অন্য দেশের ভেতর দিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু ওই যে বললাম, যতই লাইন টানো না কেন, জোর বজায় রাখা সবসময় সম্ভব হয় না। এরকম একটা ঘটনার কথা বলি শোন। ১৯৪৭এ তো দেশ ভাগ হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে পড়েছে সান্তাহার বলে পূর্ব বাংলার একটা জায়গা। এদিকে অসম থেকে কলকাতার বাজারে যে আলু পাঠানো হত তা আসত সান্তাহার পেরিয়ে। ১৯৪৮এর জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাকিস্তান সরকারকে চিঠি লিখে বলল যে যদি তাদের কৃষি বিভাগের এক অফিসারকে সান্তাহারের রেলস্টেশনে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে সুবিধে হয়। সেই অফিসার আলু ব্যবসার সব দিক লক্ষ্য রাখতে পারবেন। রেল দপ্তরকে খবর পাঠানো হল। তাতে কী জানা গেল শুনলে তোমরা অবাক হবে। জানা গেল যে এরকম একজন ভারতীয় অফিসার তো সান্তাহার স্টেশনে আছেনই। অর্থাৎ তাঁর থাকার কথা কোনও দেশের সরকারই খেয়াল করেনি। পাকিস্তানের সরকারও তাঁকে থাকার অনুমতি দেয়নি আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো

তাঁর খবর জানে না বলেই চিঠি লিখেছে। তাহলে তাঁকে থাকতে দিল কে? তার উত্তর কারও কাছেই ঠিকঠাক ছিল না। তার মানে বর্ডার এলাকায় যা যা প্রয়োজন হয়েছে, তা মেটাতে সেখানে যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা সে সময়ের মতো ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

এদিকে দেখ, এই দেশের বর্ডার কেমন একটা পোক্ত, আঁটোসাঁটো ব্যাপার ভাবছিলাম আমরা। সরকার সবসময় চায় বর্ডারকে পাকাপোক্ত করতে। তাহলেই তো বোঝানো যাবে কত ক্ষমতা। তাই বর্ডার এলাকায় এদেশ-ওদেশের মধ্যে যে ব্যবসা চলে, তার নিয়ম মাঝেমধ্যেই বদলে-বদলে দেওয়া হয়। কোন কোন জিনিস অন্য দেশে বিক্রি করা যাবে বা যাবে না, তাও বদলে-বদলে যায়। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, সব নিয়ম বদলের খবর বর্ডারের কাছাকাছি যাঁরা থাকেন, তাঁদের কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছয় না। এই মানুষেরা পড়েন মহা বিপদে। কিছু না জেনেই তাঁরা নিয়ম ভেঙে ফেলেন। সরকারেরই সবসময়ে হদিশ থাকে না তার লোকেরা বর্ডারে কী করছেন, কোথায় আছেন। বর্ডার টানার আগে যেভাবে ব্যবসা চলত, তা এখন আর করা যায় না। জিনিস লেনদেনের ওপর যেমন নিয়ম চাপে, মানুষের যাতায়াতের ওপরও তেমনই। নিয়ম চাপিয়েই সরকার বলে কে এদেশের মানুষ আর কে বিদেশি, কে নাগরিক আর কে নয়। বর্ডার এলাকায় থাকা মানুষদের যেভাবে জীবন চলত, তা হঠাৎ বদলে যায়। তাই আমরা যদি ভাবি নাগরিকদের সুবিধে-অসুবিধে মেনে নিয়ম তৈরি হয়, তা কিন্তু ঠিক নয়। যেখানে নিয়ম বদলের খবরও ঠিক সময় পৌঁছয় না, সেখানকার নাগরিকদের দেশের অন্য

নাগরিকদের মতোই সুযোগসুবিধে আছে ভাবলে ভুল হবে। কিন্তু মানুষ নিজে থেকেই কিছুটা সরকারের নজর এড়িয়ে একভাবে জীবনযাপন করেন। তাঁদের রোজকার জীবনে আশপাশের লোকজনের সঙ্গে নানান লেনদেন চলতে থাকে। তাছাড়া তাঁদের উপায়ও থাকে না।

এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, দেশের ভেতরে সব নাগরিক সমান অধিকার নিয়ে স্বাধীন ভাবে থাকতে পারেন না। সরকারের অনেক নিয়ম নীতির চাপে পড়ে এক এক জায়গায় এক এক গোষ্ঠীর মানুষ এক এক রকম থাকে। কারা কখন অধিকার পাবেন, আর কখন কাদের থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে, সেটা দেশের সরকার, অথবা অন্যান্য নাগরিক যাঁদের ক্ষমতা আছে, তাঁরাই অনেক সময়ে ঠিক করেন। আর সেই কাজটা করতে আইনের রদবদলও হয়। সীমানা যেমন সরকার খুব পোক্ত করে তৈরি করতে চেষ্টা করে, দেশের মানুষকেও সেই সীমানার ঠিক দিকেই যে তাঁরা বরাবর ছিলেন, সেটা প্রমাণ করে যেতে হয়। কাউকে বেশি করতে হয়, কাউকে কম, কাউকে আবার করতেই হয় না। আমাদের দেশে সেই দেশভাগের সময় থেকে ‘উদ্বাস্তু’, ‘বিদেশি’ অথবা ‘অনুপ্রবেশকারী’, এরকম নানান নামের ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের মানুষ নাগরিকের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছেন। এই সব নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ সমানে লড়াই করে চলেছেন, আর তাঁরা শাস্তিও পাচ্ছেন। এদিকে দেখ, সীমান্তবর্তী এলাকায় মানুষ বরাবর রোজকার জীবনে যেমন নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করেছেন, এখনও তেমনই করে চলেছেন। সরকার আইন করে ক্ষমতা

বজায় রাখার চেষ্টা করে ঠিকই, কিন্তু মানুষের সুবিধে-অসুবিধে তাঁদের নিজেদেরই অনেক সময় মিটিয়ে নিতে হয়। নাগরিকদের কথা পড়লে বোঝা যাবে যে সে ইতিহাস একরকম নয়। একটা সরলরেখার মতো নয়। আর মনে হবে একটা মস্ত ছাঁকনি সব সময় যেন তাড়া করছে। ১৯৪৭, ১৯৫৫, ১৯৭১, ১৯৮৬, ২০০৩, ২০০৫, ২০১৫, ২০১৯ — সাধারণ নাগরিকের প্রমাণপত্র, নানা মাপের কাগজ জমানোর গল্প যেন ফুরোতেই চায় না। নাগরিকত্ব আর তার ছাঁকনি যেন জীবনের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা এই মানুষদের জীবনে। ছাঁকনিতে আটকে পড়লেই হল! এই ছাঁকনি যেন দেশের মানুষকে বিপদে না ফেলে, সেই চেষ্টা করে যাওয়া আমাদের সকলের কাজ, সকল নাগরিকের দায়িত্ব।

শেষের কথা

এই এতক্ষণ ধরে এতকথা যে বললাম, তোমরা হয়তো ভাবছ এসব জানা গেল কোথা থেকে? হয়তো ভাবছ সব মনগড়া গল্পকথা। তা কিন্তু নয় মোটেও। এদিক সেদিক থেকে কীভাবে খবর জোগাড় করেছি শেষে সেকথা একটু বলি। এই যেমন ধরো, মালোপাড়ার কথা আমি জানতে পারলাম বিখ্যাত ইতিহাসবিদ উইলেম ভ্যান শেন্ডেলের বই The Bengal Borderland: Beyond State and Nation in South Asia থেকে। এই বইতেই পেয়েছি সান্তাহারের কথাও। অসম সম্বন্ধে অনেকটাই জানতে পারলাম সমাজবিজ্ঞানী নীরজা গোপাল জয়ালের বই থেকে, যার নাম Citizenship and its Discontents: An Indian History। এই বই থেকে নাগরিক আইন সম্বন্ধেও জানলাম। গঙ্গাধরের কথা অনেক কাগজপত্রে বেরিয়েছিল। তার মধ্যে একটার নাম বলে রাখি তোমাদের। তোমরাও পড়ে দেখতে পারো। ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২১ এর The Telegraph কাগজে খবরটা বেরোয়। এখন তো খবরের কাগজ ইন্টারনেটেও পড়া যায়। তোমাদের সেই কাগজটার লিঙ্কটাও দিয়ে রাখি। তাহলে তোমরা সময়-সুযোগ বুঝে পড়তে পারবে - https://www.telegraphindia.com/india/bengal-workers-plight-at-transit-camp-in-assam/cid/1830904। হাসিনা ভানুর কথা পেলাম আর একটা কাগজে যেটা ইন্টারনেট থেকেই পড়া যাবে, যার নাম Article 14। এই কাগজে ১২ই জানুয়ারি, ২০২২ এই খবরটা বেরোয়। সেটার লিঙ্কও তোমাদের দিয়ে রাখি - https://www.

article-14.com/post/assam-s-hasina-bhanu-won-a-20-year-legal-battle-to-prove-she-was-indian-it-came-at-a-cost-61de5ba1bd80d।

এছাড়াও এদিক ওদিক আরও অনেক বই কাজে লাগলো। যেই বই থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কীভাবে ভোটের বন্দোবস্ত করা হল, নাগরিকদের জন্য কীভাবে নিয়ম কানুন ঠিক করা শুরু হল, এসব কথা বেশ ভালভাবে জানলাম, সেটা লিখেছেন অরনিট শানি নামে এক ইতিহাসবিদ। বইটার নাম How India Became Democratic: Citizenship and the Making of the Universal Franchise। বুঝতেই পারছ, ইতিহাসে যে কোনও কথা যেমন তেমন করে বলার জো নেই। নানান লেখাপত্র, দলিল দস্তাবেজ, পণ্ডিতদের বইপত্র, খবরের কাগজ সব উলটে পালটে দেখতেই হয়। যে কোনও কথা কেউ বললেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। অনেকে বললেও নয়। যাচাই করে, বাছ-বিচার করে, তবেই কথা কান থেকে মনে নেওয়া যায়।

এই বইটা লিখতে আমাকে অনেকে সাহায্য করেছেন। ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে লিখলে ভাল হয়, বলে দিয়েছেন। বিশেষ করে যাঁদের কথা বলতেই হবে, তাঁরা হলেন সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, রাজর্ষি দাশগুপ্ত, কৃত্তিকা সেনগুপ্ত, শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন চক্রবর্তী, সেমন্তী ঘোষ, মানবী মজুমদার, সাবির আহমেদ, প্রিয়ঙ্কর দে, উপনীতা মুখার্জি, সুপূর্ণা ব্যানার্জি, পারমিতা চক্রবর্তী, মধুমিতা বসু, অমিতাভ গুপ্ত, আরশি পারভিন গুপ্ত, রাইশা মাহমুদ, ঐশী দত্ত, রূপকথা, মোহর সেনগুপ্ত, অন্বেষা সেনগুপ্ত এবং দেবারতি বাগচী। সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

লেখক ও শিল্পী পরিচয়

এই বইটি লিখেছেন তিস্তা দাস। তিস্তা বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ান।

বইটির চিত্র-পরিকল্পনা, প্রচ্ছদ ও মানচিত্র তৈরি করেছেন ওয়াসিম হেলাল। ওয়াসিম পেশায় গ্রাফিক ডিজাইনার। নানা দেশী বিদেশী প্রকাশনা সংস্থার সাথে ওয়াসিম বইএর ছবি, প্রচ্ছদ ও চিত্র-পরিকল্পনার কাজ করেন।

বইটির ছবি এঁকেছেন রঞ্জিত চিত্রকর ও সিরাজউদ্দৌলা চিত্রকর। তাঁরা বংশ পরম্পরায় পটশিল্পী। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার নয়া গ্রাম থেকে কাজ করেন রঞ্জিত ও সিরাজ। পটশিল্পের ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁরাও মূলত হিন্দু দেব-দেবীর আখ্যান আঁকেন ও সেই নিয়ে গান বাঁধেন। তবে এখন তাঁরা নানা অন্য বিষয় নিয়েও পট তৈরি করছেন। পটচিত্র বাংলার ধর্মীয় সমন্বয়ের ঐতিহ্যের প্রমাণ। পটশিল্পীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁরা মূলত হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে তাঁদের ছবি আঁকেন ও গান বাঁধেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের নিজস্ব সামাজিক আখ্যান অনুসারে তাঁরা হিন্দু দেবতা বিশ্বকর্মার বংশধর। এভাবে তাঁদের জীবনে ও কাজে ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম মিলেমিশে রয়েছে।

The **Institute of Development Studies Kolkata (IDSK)** was set up in 2002 by the Government of West Bengal as an autonomous centre of excellence in social sciences. It is a society with an autonomous governing body with eminent scholars and Government's nominees. IDSK is recognized for its advanced academic research and informed policy advice in the areas of literacy, education, health, gender, employment, technology, communication, human sciences and economic development. The academic programmes at IDSK include MPhil (2006-2022) and PhD in social sciences and short training courses for research scholars. It offers state-of-the-art IT and library facilities to its students and research scholars. It is fully funded by the Government of West Bengal. IDSK has been recognized by the ICSSR under the category of "ICSSR Recognized Research Institutes".

The **Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)** is a German political foundation that is part of the democratic socialist movement. True to the legacy of its namesake Rosa Luxemburg (1871-1919), it stands in solidarity with the workers' and women's rights movements. the organization serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as research centre for social development. The RLS has close ties to the German party DIE LINKE. RLS provides political education and a centre for advanced social research in both Germany and throughout the world. RLS is one of six party-affiliated political foundations in Germany; it supports partners in over 80 countries striving for social justice, strengthening public participation, and social ecological development.

চোখ-কান খোলা রেখে ইতিহাস শেখা যায় কেমন করে? ইতিহাস-সচেতন হওয়া কাকে বলে? এইসব প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে 'ইতিহাসে হাতেখড়ি' সিরিজের কথা ভাবা। একেকটি বই একেকটি বিষয় নিয়ে। লেখার সঙ্গে থাকছে পটচিত্র শিল্পীদের আঁকা ছবি। ইতিহাসের নানা সময়, নানা জটিল ধারণা সহজভাবে বুঝিয়ে বলাই এই বইগুলোর উদ্দেশ্য। বইগুলো পড়ে ছোটরা প্রশ্ন করতে শিখবে - এমনটাই আমাদের আশা।

IDSK

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA